হযরত ফাতেমা যোহরা

হযরত ফাতেমা যোহরা
রাদিয়াল্লাহু আনহা

কাজী আবুল হোসেন

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৮১

১ম প্রকাশ ১৯৮০

৭ম প্রকাশ

রজব	১৪৩০
আষাঢ়	১৪১৬
জুন	২০০৯

বিনিময় মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

HAZRAT FATIMA ZOHRA by Quzi Abul Hossain. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 20.00 Only.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা। তাঁর মর্যাদা ও গুণের পরিচায়ক তাঁর পবিত্র নাম বা উপাধি। যথাক্রমে হযরত ফাতেমা, যোহরা, তাহেরা, যাকিয়া, বতূল প্রভৃতি তাঁর বিশেষ বিশেষ গুণ প্রকাশক উপাধি।

আরবী 'ফতম' শব্দটির অর্থ 'পার্থক্য করা'। সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় বা সত্য রক্ষা করাই হচ্ছে এর অন্তর্নিহিত অর্থ। তিনি যাকে ভালোবাসেন বা যিনি তাঁকে ভালোবাসেন—তিনি জাহান্নামের ভয়ানক আযাব হতে রক্ষা পাবেন।

'যহরত' শব্দটির প্রকৃত অর্থ 'সৌন্দর্যময়', 'উজ্জ্বল'। নানা সদগুণে বিভূষিতা ছিলেন বলে তাঁর অন্যতম উপাধি 'যোহরা'। 'তুহর' থেকে 'তাহেরা' নামের উৎপত্তি। 'তুহর' অর্থ 'পবিত্র'।

এমনি সব বিশেষ গুণের পরিচায়ক ছিলো তাঁর নামে। দুনিয়ার রমণীকুলের তিনি আদর্শস্থানীয়া,—পরকালে জান্নাতের নারীদের ওপরও থাকবে তাঁর প্রভাব। তিনি হবেন তাঁদের মুকুটমণি বা মধ্যমণি।

শৈশব থেকে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার মধ্যে দেখা যায় ধৈর্যের লক্ষণ। সরল প্রকৃতি ও সুবিবেচনার জন্যও তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয়া। মেয়েদের প্রকৃতি সাধারণত চঞ্চল এবং খেলাধূলার প্রতি আকৃষ্ট ; কিন্তু মা খাতুনে জান্নাতের প্রকৃতি সে রকম ছিলো না। তিনি কোনো ক্রীড়া-কৌতুক দেখার জন্য কোনো জায়গায় যেতেন না, বরং মায়ের কাছে চুপচাপ বসে থাকতেন।

তার এ সরল এবং সংসার নির্লিপ্ত ভাব নবীজীর বড়ই ভালো লাগতো। তাঁর এ মেয়েটি যে ভবিষ্যতে অন্য প্রকৃতির হবেন, তা তিনি বেশ বুঝেছিলেন। 'বতূলের' প্রকৃত অর্থ 'সংসার নির্লিপ্ত'।

নবীজীর সুন্দর আকৃতি ও আচরণের এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ছিলেন নবী-দুহিতা হযরত ফাতেমা যোহরা।

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের পাঁচ বছর আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময় নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স ছিলো ৩৫ বছর এবং সে সময় কা'বা মসজিদ পুনর্নির্মিত হয়।

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারবর্গ যখন মদীনায় গমন করেন তখন পর্যন্ত ফাতেমা ছিলেন অবিবাহিতা। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীগণ নবী দুলালীর পানি প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় ছিলেন। আল্লাহর হুকুম ছাড়া একটা নিঃশ্বাস গ্রহণও যে তাঁর জন্য সম্ভবপর ছিলো না।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য সাহাবী ও মহিলারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এ বিয়ের প্রস্তাবের ব্যাপারে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই দ্বিধার মধ্যে ছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের উক্তি, "আমার একজন বাঁদী ছিলো, আমি তাকে আজাদ করে দিয়েছিলাম, সে-ও এ বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার জন্য বার বার আমাকে অনুরোধ করছিলো। আমি আমার অসচ্ছল অবস্থার জন্য ইতস্তত করছিলাম। অবশেষে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু ভক্তি ও ভয়ের প্রভাবে তাঁকে মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারলাম না। চুপচাপ তাঁর পাশে গিয়ে বসে রইলাম।

স্বয়ং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—বোধ হয় তুমি তোমার সাথে ফাতেমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছো? আমি জবাব দিলাম—জি হ্যাঁ। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্ন করলেন—মোহর পরিশোধের মত কোনো কিছু কি তোমার আছে? আমি বললাম—সে রকম কোনো জিনিসই আমার নেই।

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—আমি তোমাকে যে লোহার বর্ম দিয়েছিলাম, মোহরানার বদলে তাই দিও।"

ঐ বর্মের দাম চারশো দেরহামের বেশী ছিলো না।

আকাশের অদৃশ্য লোকের কাহিনী.....

আল্লাহর হুকুমে সেখানে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ফাতেমা যোহরা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিবাহ সম্পন্ন হচ্ছিল। আল্লাহর ফেরেশতা এ সুসংবাদ বহন করে ধূলার ধরণীতে এলেন।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ শুভ সংবাদ পেলেন .....

"আকাশে বাতাসে চলে কানাকানি,—
ধরার ধূলিতে ফুটেছে ফুল,
সে ফুলের বাস লয়ে যায় টানি,
সুদূর আকাশে,—কে সে রাতুল ?"

একখানা তলোয়ার, একটা উট ও একটা বর্ম ছাড়া হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর আর কোনো সম্বলই ছিলো না। তবে তিনি নিজে ছিলেন বীর, বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান যুবক।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধারাও ছিলো অভিন্ন ।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উট এবং তলোয়ারখানা রাখার উপদেশ দিলেন। কারণ বর্ম ছাড়া যুদ্ধ করা চলে, কিন্তু তলোয়ার ও উট নিতান্ত দরকারী। এ সময় ইসলামদ্রোহীগণ প্রায়ই মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট মনে করলেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্মখানা খুব উৎকৃষ্ট ধরনের ছিলো। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ বর্ম তিনশো ষাট দেরহাম দিয়ে কিনে নিলেন। কিন্তু কিছু স্নেহমধুর বাক্য বিনিময়ের পর ঐ বর্ম আবার তাঁকেই ফিরিয়ে দিলেন।

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হৃদয় ছিলো করুণার প্রস্রবণ। তিনি ইসলাম তথা মুসলমানদের জন্য কোনো ত্যাগকেই জীবনে বড় মনে করেননি।

ঊর্ধাকাশ থেকে এই শুভ পরিণয়ের খবর বহন করে যখন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মদীনার পবিত্র ভূমি স্পর্শ করলেন এবং নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সব খবর জানালেন। তখন তিনি হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নিজের পাশে ডেকে এ সংবাদ দিলেন। মা খাতুনে জান্নাত লজ্জায় অধোবদন হলেন।

এ সময় থেকেই মুসলিম নারীকুলে বিয়ের ব্যাপারে কোনো কন্যার মৌনতাকে সম্মতি বলে ধরা হয়ে থাকে।

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মসজিদে সমাগত মুহাজির ও আনসারদের সম্বোধন করে বললেন, "হে মুহাজির ও আনসার দল! হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মহা মহিমান্বিত আল্লাহর আদেশ বহন করে এনে আমাকে জানিয়ে দিলেন যে, বায়তুল মামুরে আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের একত্রিত করে তাঁর বাঁদী মুহাম্মাদ দুহিতা ফাতেমার সাথে তাঁর অপর সম্মানিত বান্দা আবু তালেব তনয় আলীর বিবাহ সম্পাদন করলেন এবং তিনি আমাকে আদেশ করলেন যেন আমি ন্যায়বান ব্যক্তিদের সাক্ষী রেখে তাদের সামনে ইহলোকে ইজাব কবুল করিয়ে দিই।"

খুতবা শেষ হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সম্বোধন করে বললেন, "আমি চারশো মিসকাল মোহরের বিনিময়ে ফাতেমাকে তোমার হাতে সম্প্রদান করলাম, তুমি রাজী আছ?" হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বিনীতভাবে বললেন, —"জী হ্যাঁ, রাজী।"

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাজাত করলেন, আল্লাহ তোমাদের দু'জনের চিন্তা দূর করে দিন। তোমাদের সব চেষ্টা সফল করুন। তোমাদের দু'জনের ওপর কল্যাণ বর্ষিত করুন। তোমাদেরকে সুসন্তান প্রদান করুন।

এই মুনাজাতের পর বিবাহ মজলিসে সোহারাপূর্ণ পাত্র রাখা হলো এবং হাজেরানে মজলিসকে ঐ সোহারা ভাগ করে নিতে বলা হলো।

নবী দুহিতার উপঢৌকন ক্রয়ের জন্য হযরত আবু বকর, হযরত সালমান ফারসি ও হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুম বাজারে গেলেন।। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সওদা ক্রয়ের জন্য তিনশো ষাট দেরহাম দিয়েছিলেন। উপঢৌকন হিসেবে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নিম্নোক্ত দ্রব্য দেয়া হয়েছিলো ঃ

উলভরা একখানা কাপড়ের ফরাশ, একখানা চামড়ার ফরাশ, একটা খেজুরের ছাল ভরা তাকিয়া, একটা উলভরা তাকিয়া, একখানা রেশমের চাদর, দুটো সুতী চাদর, দুটো মাটির কলস, দুটো রুপার বাজুবন্দ, একখানা বড় চাদর, একখানা যাঁতা, একটা মশক, একটা পেয়ালা, একখানা পালঙ্ক ও একটা জায়নামায।

এ দ্রব্যাদির দিকে তাকিয়ে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশ্রুসজল নয়নে প্রার্থনা করলেন! "হে রাহমানুর রাহীম এই সকলকে কল্যাণপ্রদ কর।" এসব ক্রয় করে তিনশো ষাট দেরহামের যা উদ্বৃত্ত রইলো, তা দিয়ে স্ত্রীলোকদের প্রয়োজনীয় সুগন্ধি, আতর প্রভৃতি কিনে তিনি উম্মাহাতুল মুসলিমীন হযরত উম্মে সালামার হাতে দিলেন।

বিবাহকালে নবী দুহিতার বয়স ছিল মাত্র পনেরো বছর পাঁচ মাস। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স ছিলো একুশ বছর মাত্র। দ্বিতীয় হিজরীর শেষভাগে এই শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। আনন্দ প্রকাশের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পবিত্র বিবাহে মেয়েদের 'দফ' বাজাতে সম্মতি জানিয়েছিলেন।১

বিবাহের ওলিমা বা ভোজের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে কিছু খুরমা ও মোইজ দিয়েছিলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐগুলো যবের ছাতুসহ বন্ধুদের সামনে হাজির করলেন। প্রসন্ন মনে সকলেই ঐ খাদ্য গ্রহণ করলেন।

১. নাসেখুত তাওয়ারিখ।

দুলহা-দুলহানের স্বাধীনভাবে বসবাস আরম্ভ

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবার ছোট দেখে একটা বাড়ী ভাড়া নিলেন। নতুন সংসার—সবকিছুই নতুন। তদুপরি তেমন টাকা পয়সার জোরও নেই। কিন্তু বাড়ী ভাড়া নিলে কি হবে ; হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রকৃতি এমনই লাজুক ছিলো যে, তিনি একবারের জন্যও মা খাতুনে জান্নাতকে নিজ বাড়ী নিয়ে যাওয়ার কথা বলতে পারলেন না। এমন কি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকার-ইঙ্গিতে অন্যের অনুপস্থিতিতে একথা বলতেনও, কিন্তু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু লজ্জায় কিছু বলতে পারতেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার তাঁকে বলেছিলেন,—'হে আলী তোমার গৃহিণী তোমার সৌভাগ্যের কারণ হোক।' কিন্তু তবুও হযরত আলী কিছুই বলতে পারলেন না, মুখের ভাষা যেন হারিয়ে গেলো। মনের কথা গলার পাশে এসে আটকে গেলো। কোনো শব্দ বেরুলো না।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সহোদর আকীল একদিন তাঁর হাত ধরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে যেতে লাগলেন। প্রথমেই পথে তাঁদের দেখা হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মায়ের আমলের দাসী উম্মে আইমানের সাথে। হযরত আকীল তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। তিনি তাঁদের প্রথমে উম্মুল মুমিনীনের সাথে সাক্ষাত করতে পরামর্শ দিলেন। তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার হুজরায় ছিলেন। হযরত উম্মু সালামা অন্যান্য নবী-জায়াদের সাথে করে সেখানে হাজির হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর হাবিব আপনার চাচাতো ভাই আলী তাঁর স্ত্রীকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য অভিলাষী হয়েছে, কিন্তু সে বড়ই লজ্জাশীল ও শিষ্ট প্রকৃতির যুবক। কাজেই নিজে সে এ বিষয়ে আপনাকে জানাবার মত সাহস সঞ্চয় করতে পারছে না।"

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ মত উম্মুল মু'মিনীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর সামনে হাজির করলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে প্রশ্ন করলেন, — "আলী আমি তোমার স্ত্রীকে বিদায় করে দেই, এই কি তোমার ইচ্ছা ?"

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আদবের সাথে মাতা নত করে জবাব দিলেন,—"জ্বী হাঁ, এই আমার আরজ।"

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন কয়েকটি দেরহাম তাঁর হাতে দিয়ে বললেন,—সোহারা, পনীর প্রভৃতি নিয়ে এসো।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু পাঁচ দেরহামের ঘি, চার দেরহামের সোহারা ও এক দেরহামের পনীর নিয়ে এলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে ঐ সকল জিনিস রুটির সাথে মেখে জলীস তৈরী করলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি বললেন, বাইরে যে মুসলমানের দেখা পাও তাকে সাথে করে এখানে নিয়ে এসো। মুহাজিরীন এবং আনসারদের একদল এসে 'জলীস' খেয়ে চলে গেলেন। অবশিষ্ট 'জলীসে'র কিছু অংশ মাটির একটা পেয়ালায় ভরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটুকু ফাতেমা এবং তাঁর স্বামীর জন্য। বাকী 'জলীস' তিনি সেখানে উপস্থিত উম্মুল মুমিনীন ও অন্যান্য মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। অতপর তিনি হযরত ফাতেমা যোহরা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে হাজির করতে বললেন। তিনি মা খাতুনে জান্নাতের কপালে চুমু দিয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতের ওপর তাঁর হাত রেখে বললেন, "হে আলী! তোমার জন্য নবী নন্দিনী ফাতেমা কল্যাণের কারণ হোক এবং হে ফাতেমা! তোমার স্বামী আলী সব দিক দিয়েই প্রশংসার যোগ্য। এখন তোমরা স্বামী-স্ত্রী নিজ গৃহে গমন কর।"

এ ঘটনার পর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য কি এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য কি—এ সম্বন্ধে কিছু নসিহত করলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে তাঁদের বিদায় দিলেন এবং তাঁদের উন্নতি কামনায় আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন।

একটি উটের পিঠে চড়ে হযরত আলী ও মা খাতুনে জান্নাত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বাসস্থানের দিকে এগিয়ে চলছিলেন। হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ উটের লাগাম ধরে এগিয়ে চললেন।

পরদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামাই বাড়ী বেড়াতে গেলেন। কন্যাকে তিনি এক পেয়ালা পানি আনতে বললেন। কিছু পাঠ করে তিনি ঐ পানিতে ফু দিলেন। তারপর ঐ পানি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কিছু পান করিয়ে অবশিষ্ট পানি তাঁর বুকে মুখে দিয়ে কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন। মা খাতুনে জান্নাতকে অপর এক বাটি পানি পড়ে অনুরূপ কাজ করলেন।

'উম্মে রাফেয়া' অথবা 'সালমা' ছিলেন বিবি খাদিজার সময়কার দাসী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হঠাৎ তাঁকে এখানে দেখে আশ্চর্যন্বিত হয়ে বললেন,—"তুমি এখানে কেন ?"

সালমা বললেন,—"যখন উম্মুল মু'মিনীন রোগ শয্যায় তখন তিনি একদিন রোদন করছিলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, আম্মা আপনার কান্নার কারণ কি ? আপনি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী, শেষ নবীর সাথে আপনি যে মধুর ব্যবহার করেছেন তা তিনি প্রায় উল্লেখ করে থাকেন। আমার এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন,—'সালমা—মেয়ে যখন স্বামীর ঘরে যায় তখন তার একজন বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন সাহায্যকারিণী মহিলার খুবই দরকার হয়ে থাকে। আর ফাতেমা এখন খুবই অল্পবয়স্কা,—সে সময় যদি তার জন্য সে রকম একজন সাহায্যকারী না পাওয়া যায় সেই চিন্তায় আমার চোখ দিয়ে পানি ঝরছে।"

তাঁর চিন্তার কারণে আমি সেদিন তাঁকে কথা দিয়েছিলাম যে, "আমি এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবো। দয়াময় আল্লাহ পাককে অশেষ ধন্যবাদ যে, তিনি আমাকে সে কথা রক্ষা করার তাওফিক দান করেছেন।" সালমার কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তিনি তাঁকে দোয়া করলেন।

অতপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ময়দা দিয়ে রুটি তৈরী ও ঘর ঝাড়ু দেয়া ইত্যাকার

ঘরের কাজের বিষয়ে কিছু উপদেশ দিলেন। অনুরূপভাবে তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বাজার থেকে সওদা আনা, উট চরানো প্রভৃতি বাইরের কাজের বিষয়ে উপদেশ দিলেন।১

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যে বাড়ীতে থাকতেন ঐ বাড়ীটা ছিলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থান স্থল থেকে বেশ খানিকটা দূরে। এজন্য যাতায়াতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটু কষ্ট হতো। হযরত হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু একথা জানতে পারলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবাস ভবনের পার্শ্বস্থ একটা বাড়ী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য ছেড়ে দিলেন।

মা খাতুনে জান্নাতকে পতিগৃহে বিদায় দেয়ার আগের ঘটনা .....।

একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন,—মা ফাতেমা সাধারণ কাপড় পরে খুব উদাস মনে মাথা নিচু করে বসে আছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পারলেন—হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দারিদ্র্যের কথা ভেবেই তিনি ম্রিয়মান হয়ে পড়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, —"হে কন্যা, এজন্য তুমি দুঃখিত হয়ো না। কারণ তোমার স্বামীর চেয়ে কোনো যোগ্য লোককে আমি আর পেলাম না। আলীর গরীব হালের জন্য ভেবো না। এ দুনিয়ার অভাব চিরস্থায়ী নয়—মাত্র কয়েকদিনের জন্য। যাতে পরকালে সুখ সমৃদ্ধি লাভ করতে পারো, সেদিকে খেয়াল রেখো। পরকালের সব বৈভব তোমাদের অধিকারে রয়েছে। এ জীবনে দারিদ্র্য ও অভাবের চিন্তা একটা বাজে চিন্তা মাত্র।"

১. উসুদুল গাবাহ।

স্বামী গৃহের পরিবেশ

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু গরীব ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর শারীরিক ও মানসিক গুণ ছিলো যথেষ্ট। এদিক দিয়ে তিনি ধনবান ছিলেন। 'তাবুকের' যুদ্ধ ছাড়া আর সব যুদ্ধেই তিনি উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধে তিনি দৈহিক বল ও রণকৌশলের যে পরিচয় দিতেন, তা অতুলনীয়। পাণ্ডিত্য ও ইসলামী জ্ঞানে ছিলেন অসাধারণ। ব্যবহারের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন খুবই ভদ্র। বিবাহকালে তাঁর বয়স ছিলো মাত্র একুশ বছর, একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এই একুশ বছর বয়সে তিনি সবদিক দিয়ে এমনই অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন যে, হযরত আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ন্যায় বিজ্ঞ সাহাবীগণ তাঁকে নবী নন্দিনীর উপযুক্ত পতি হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন।

এ অতীব দরিদ্র ও সৎ প্রকৃতির তরুণের সহায় সম্বল বলতে যদিও মাত্র একটা উট, একখানা তরবারী ও একটা বর্ম ছিলো,—সেজন্য কিন্তু কারো মনে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা সম্বন্ধে কোনো সংশয় দেখা দেয়নি। টাকা দিয়ে মানুষের মান-মর্যাদা ওজন করার মত কুৎসিত উপায় তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেক সময় কায়িক শ্রম দিয়ে উপার্জন করতেন।

এ দরিদ্র্যের গৃহিণী হয়ে নবী নন্দিনী হাসিমুখে কাটিয়ে গেছেন সারাটা জীবন। মাঝে মাঝে অভাব এমন কঠিন রূপ নিয়ে আসতো যে, তিনি প্রায় ধৈর্যহারা হয়ে পড়তেন। কিন্তু করুণাময় আল্লাহকে স্মরণ করে দুনিয়ার এসব আঘাতকে তিনি নীরবে সহ্য করে যেতেন। স্ত্রী এবং গৃহিণীর কর্তব্য কখনো তিনি ভুলতেন না।

হযরত হাসান বসরী হতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, "ফাতেমা আল্লাহর ইবাদাতে বহু সময় ব্যয় করলেও ঘর-গৃহস্থালীর কাজে তাঁর কোনো ত্রুটি আমি পাইনি।"

..... জীবনের প্রথম দিকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়, অতি কষ্টে কায়িক পরিশ্রম করে তিনি জীবিকার্জন করতেন। একদিন এমন হলো,—সারাদিন কোনো কাজ জুটলো না। স্বামী-স্ত্রী দু'জন অনাহারে কাটিয়ে দিলেন। সন্ধ্যার

সময় একজন সওদাগরের মাল বোঝাই উট বাজারে এলো। মাল নামাতে অনেক রাত হয়ে গেলো। এ কাজ করে তিনি এক দেরহাম (চার আনার সামান্য বেশী) মজুরী পেলেন। কিন্তু মজুরী যাই পান না কেন, ক্ষুধার অন্ন সংগৃহিত হবে কি ভাবে ? দোকান যে সব বন্ধ! এত রাত পর্যন্ত কে আর জেগে বসে থাকবে ?

পরিশ্রান্ত হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘুরছেন বাজারের পথে পথে। হঠাৎ দেখা গেলো একটা দোকান খোলা রয়েছে। সেখান থেকে কিছু যব খরিদ করে ঘরে ফিরলেন। হযরত ফাতেমা যোহরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। তখনই সেই যব পিষে রুটি তৈরী করে আগে স্বামীকে খাওয়ালেন, পরে নিজে খেলেন। হযরত আলী বলেছেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন যে, ফাতেমা দুনিয়ার স্ত্রীলোকদের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ। যখন আমার একথা স্মরণ হলো, তখন আমি আল্লাহর কাছে তাঁর দয়ার শোকর করতে লাগলাম।" অন্য এক জায়গায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "যখন নবী দুলালীর সাথে আমার বিয়ে হলো, তখন আমার এমন অবস্থা ছিল যে, একখানা ভেড়ার চামড়া ছিলো তার উপর উটকে খাওয়াতাম এবং রাতে ঐ চামড়া বিছিয়ে শয়ন করতাম। আমার চাকর-গোলাম ছিলো না, নিজের হাতেই যাবতীয় কাজ করতে হতো।"

হযরত ফাতেমা যোহরা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকালের পর কেউ এসে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন,—আপনার সাথে নবী কন্যা কেমন ব্যবহার করতেন ?

জবাবে তিনি বললেন, "ফাতেমা জান্নাতের ফুল ছিলো, তাঁর পাঁপড়ি খসে পড়েছে, কিন্তু এখনও সুরভী পাওয়া যাচ্ছে।"

হযরত ফাতেমা যোহরা রাদিয়াল্লাহু আনহার যখনই রান্না শেষ হতো,—প্রথমে স্বামীকে খাওয়াতেন, পরে সন্তানদের খেতে দিতেন এবং সবার শেষে নিজে খেতেন। কিন্তু এর মধ্যে যদি কোনো অন্ন প্রার্থী এসে জুটতো, তবে নিজের খাবার তাকে দিয়ে তিনি অভুক্ত থাকতেন।

ঘরের যাবতীয় কাজ নবী কন্যা নিজের হাতে করতেন, একথা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। যাঁতা পিষতে পিষতে তাঁর হাতে প্রথমে

ফোসকা পড়ে, পরে সেটা কড়ায় পরিণত হয়। মশক ভর্তি পানি টানতে টানতে তাঁর পাঁজরে কালো দাগ পরে গিয়েছিলো।

.....সেবার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও নবী নন্দিনী শুনতে পেলেন, যুদ্ধ জয়ের পর অনেক গোলাম-বাঁদী মদীনায় আনা হয়েছে। মা খাতুনে জান্নাত ও তাঁর স্বামী উভয়ে কাজের জন্য একটা গোলাম-বাঁদীর প্রার্থনা জানালেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের প্রার্থনার জবাবে বললেন,—"এমন অভাবগ্রস্ত মানুষ এখনও পাঁচশো জনের অধিক এখানে উপস্থিত। এ গোলাম-বাঁদী ও যুদ্ধলব্ধ সমুদয় সামগ্রী বিক্রি করলেও তাদের অভাব দূর করা সম্ভব হবে না।" একথা শুনে দু'জনেই ফিরে এলেন।

খায়বারের যুদ্ধ জয়ের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মা খাতুনে জান্নাতের ঘরে একজন বাঁদী পাঠালেন। তিনি নিজের কন্যাকে বলে পাঠালেন,—"ঘরের অর্ধেক কাজ তুমি নিজে করো, অর্ধেক একে দিয়ে করিয়ো,—দু'জনে মিলে যাঁতা পিষবে। তুমি নিজে যা খাবে, একে তাই খেতে দিবে।"

হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, —"হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ মত আমি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডাকতে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম, নবী দুহিতা তাঁর ছোট ছেলে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কোলে করে যাঁতা পিষছেন।

নাসেখুত তাওয়ারিখের বর্ণনায় দেখা যায়,—অনেক সময় নবী কন্যা দু'দিন পর্যন্ত অনাহারে থেকে ছেলে কোলে করে যাঁতা পিষতেন।

মুহাদ্দিস মোল্লা জামালুদ্দীনের বর্ণনায় দেখা যায়—এক দিন নবী নন্দিনী ফাতেমা যোহরা রাদিয়াল্লাহু আনহা মসজিদে প্রবেশ করে রুটির একটা ছোট টুকরো নবীজীর হাতে দিলেন। নবীজী ঐ রুটির টুকরো হাতে নিয়ে বললেন—এ রুটি কে পাঠিয়েছে?

নবী নন্দিনী বললেন—আজ তিন বেলা অনাহারের পর কিছু যবের যোগাড় হয়। তাই পিষে রুটি তৈরী করে ছেলেদের খাইয়ে এটুকু আপনার জন্য এনেছি।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—কন্যে আজ চতুর্থ বেলা অনাহারের পর এই রুটির টুকরোটা তোমার পিতার মুখে প্রবেশ করলো।

একদিন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘরে এসে মা খাতুনে জান্নাতকে জিজ্ঞেস করলেন, আহার করার মতো কোনো কিছু ঘরে আছে কি ? মা খাতুনে জান্নাত তাঁর কথার জবাবে বললেন,—আজ তিন দিন থেকে একটা যবের কণাও ঘরে নেই। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন,—আগে আমাকে একথা জানাও নি কেন ? মা খাতুনে জান্নাত বললেন,—স্বামীর ঘরে বিদায় দেয়ার সময় আব্বাজান আমাকে নসিহত করেছিলেন যে,—কোনো সময় আপনার কাছে কিছু চেয়ে যেন আপনার মনে কষ্ট না দিই। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুখ এক অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত হলো। নবী নন্দিনীর এ বাণী তাঁর মর্মস্থলে এক শিহরণ সৃষ্টি করলো।

একবার নবীজী সফর থেকে ফিরে এসেছেন। দেখা করতে চললেন কন্যার ঘরের দিকে। দেখতে পেলেন,—একখানা রঙীন পর্দা ঝুলছে মা খাতুনে জান্নাতের দরজায়। তিনি নিজে রূপার বালা পরিধান করেছেন। দুনিয়ার প্রতি কন্যার আসক্তি দেখে তিনি কোনো কথা না বলে ফিরে গেলেন। মা ফাতেমা কেঁদে আকুল।

এমন সময় সেখানে এলেন নবীজীর অন্যতম গোলাম হযরত আবু রাফে'। মা খাতুনে জান্নাত তাঁর মুখে জানতে পেলেন,—রূপার বালা ও রঙীন পর্দা দেখে নবীজী বিমুখ হয়ে ফিরে গেছেন।

আল্লাহর রাসূলের প্রসন্নতার কাছে এ কি কোনো মূল্য বহন করে ? দরজার পর্দা আর রূপার বালা তখন তখনই গরীবদের মধ্যে খয়রাতের জন্য আল্লাহর রাসূলের কাছে প্রেরিত হলো। তিনি ঐগুলো বিক্রি করে আসহাবে সুফ্ফাদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন,—"হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের জায়া এবং বংশের লোকজনকে সেই পরিমাণ মাত্র জীবিকা দাও, যাতে তারা তোমার অবাধ্য বা কোনো রকম পাপে লিপ্ত না হয়।"

হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় দেখা যায়, বনু সুলাইম বংশের এক ব্যক্তি এসে "হে মুহাম্মাদ! হে মুহাম্মাদ!' বলে চীৎকার করতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, তুমি কি সেই যাদুকর যার ছায়া দেখা যায় না ? যদি আমার বংশের লোকজন অসন্তুষ্ট না হতো, তাহলে তুমি বের হওয়া মাত্র এক আঘাতে তোমার মাথা কেটে ফেলতাম।"

লোকটার এ অশিষ্ট ব্যবহারের শাস্তি দেয়ার জন্য হযরত ওমর এগিয়ে এলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বাধা দিলেন। তিনি ঐ লোকটির সাথে বিনম্র ব্যবহার করতে লাগলেন। মিষ্টভাবে আলাপ করতে করতে এক সময় ঐ লোকটি তাঁকে অল্লাহর পয়গাম্বর বলে স্বীকার করে নিল এবং ইসলাম গ্রহণ করলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি কোনো সম্বল আছে ?' লোকটি শপথ করে বললো,—তার কওমে চার হাজার লোক আছে এবং তার মধ্যে সে সবচেয়ে গরীব।

আল্লাহর নবী তাঁর সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে বললেন,—কেউ কি একে একটা উট দিতে পারো ? আল্লাহ তাকে ঐ উটের দামের বহুগুণ বেশী বদলা দিবেন এবং আমি তার যামিন রইলাম। সাহাবীদের ভিতর থেকে সা'দ বিন এবাদ ঐ লোকটাকে একটা উট দিলেন। পুনরায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে বললেন,—তোমাদের মধ্যে কেউ কি এর মাথা ঢাকার কিছু দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি চাও ? হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর আমামা ঐ লোকটাকে দিয়ে দিলেন। পুনরায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,—কেউ কি এ লোকটির খানাপিনার যোগাড় করে দিতে রাজী আছ ?

হযরত সালমান ফারসি লোকটিকে সাথে করে সাহাবীদের বাড়ী বাড়ী চললেন। কয়েকটা বাড়ীতে গেলেন, কিন্তু আহারের কোনো রকম ব্যবস্থা হলো না। বাধ্য হয়ে তিনি মা ফাতেমার বাড়ীর দরজায় করাঘাত করলেন।

মা ফাতেমা ঘটনা শুনে কেঁদে ফেললেন। তিনি বললেন,—সালমান, যিনি আব্বাজানকে পয়গাম্বর করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ! আজ তিন দিন আমাদের ঘরে এক কণা খাদ্যও নেই। কিন্তু সায়েলকে খালি

হাতে ফিরিয়ে দিতে নেই,—কাজেই তুমি আমার এ চাদরটা সামউন ইহুদীর কাছে বন্ধক রেখে সামান্য কিছু যব ধার নিয়ে এসো। হযরত সালমান তাই করলেন।

সামউন ইহুদী চাদর দেখে বিহ্বল হয়ে গেলো। সে বললো,—"হযরত মূসা তাওরাতে এ সম্প্রদায়ের কথাই বলে গিয়েছেন। চাদর বন্ধক দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই,—যত খুশি যব নিয়ে যাও।" যব নিয়ে ফিরে এলেন হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

মা খাতুনে জান্নাত ঐ যবের আটা পিষে রুটি তৈরী করে সবগুলোই পাত্রে বোঝাই করে নবীজীর খেদমতে পাঠালেন। হযরত সালমান ফারসী দু একটি রুটি ছেলেদের জন্য রাখার অনুরোধ জানালেন।

হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার জবাবে বললেন, এ খাবার আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করেছি,—ছেলেদের জন্যও এ থেকে সামান্য নিতে পারি না।

হযরত সালমান ঐ রুটি সবই নবীজীর খেদমতে পেশ করলেন। তিনি ঐগুলো লোকটিকে দিয়ে দিলেন। অতপর নবীজী স্বয়ং মা খাতুনে জান্নাতের কাছে গিয়ে সন্তোষ সহকারে দোয়া করলেন,—"হে আল্লাহ! ফাতেমা তোমার বাঁদী, তার প্রতি সন্তুষ্ট থেকো।"

মা ফাতেমার জ্যেষ্ঠপুত্র হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, —"একবার একবেলা উপবাসের পর আমাদের ভাগ্যে কিছু খাবার জুটলো—আব্বাজান ও আমাদের দু ভাইয়ের খাওয়া শেষ হলো,—আম্মা খেতে বসবেন,—এমন সময় একজন ভিখারী এসে দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিল,—হে নবী নন্দিনী ! আমি দুবেলা থেকে অনাহারে আছি—আমার পেট ভরিয়ে দিন।

যে গ্রাসটি আম্মাজান মুখে তুলছিলেন তা পুনরায় বরতনের ওপর নামিয়ে রেখে আমাকে ঐ খাদ্যদ্রব্য ফকিরকে দিতে আদেশ করলেন। তিনি বললেন,—আমি শুধু এক বেলা খাইনি—কিন্তু ঐ লোকটা দুবেলা থেকে উপবাসে আছে।

আমি খাবার নিয়ে গিয়ে ভিখারীর হাতে দিলাম।"

মাত্র দশ বছর বয়স থেকেই মা খাতুনে জান্নাতের পবিত্র স্বভাবের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে । শাম বা সিরিয়ায় ঐ সময় ফাতেমা নাম্নী এক ধনাঢ্য মহিলা বাস করতেন। নবী-নন্দিনীর খ্যাতি শুনে তিনি তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন। সাথে আনলেন নানাবিধ মূল্যবান উপঢৌকন। স্বর্ণ-রৌপ্য ও হীরা-জহরতের দামী জিনিস ও নানারকম উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য তিনি এনে নবী কন্যার খেদমতে পেশ করলেন। তিনি ঐ মহিলার অনুমতি নিয়ে স্বর্ণ-রৌপ্যের যাবতীয় দ্রব্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠিয়ে দিলেন বিলিয়ে দেয়ার জন্য, আর এ খাদ্যদ্রব্য দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন।

সিরীয় কন্যা ফাতেমা নবী নন্দিনীর এ ত্যাগ দেখে বিস্মিত হলেন। মানুষ এভাবে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে কি !.....

এ মহিলা প্রায়ই নবী নন্দিনীকে দেখতে আসতেন।

ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ এহ্ইয়া-উল-উলুম-এ লিখেছেন,—"একবার নবী নন্দিনী পীড়িত হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে নবীজী তাঁর জনৈক বিখ্যাত সাহাবী ইমরান বিন হোসাইনকে সাথে নিয়ে কন্যার খোঁজ নিতে গেলেন। সাথীকে নিয়ে ভিতরে যাওয়ার প্রস্তাব করতে মা খাতুনে জান্নাত বলে পাঠালেন,—আমার গায়ে এক আবা ছাড়া আর কোনো কাপড় নেই। মাথা ঢাকবার মতোও কিছু নেই।'

নবীজী বলে পাঠালেন,—ঐ আবা সেমীজের মতো পরিধান করে আমার এ পাগড়ী দিয়ে বতূলকে মাথা ঢাকতে বলো। নবী নন্দিনী তাই করলেন।

নবীজী ভিতরে এলে তিনি তাঁকে জানালেন, তাঁর সমস্ত শরীরে অসহ্য ব্যথা। আরো কষ্টের কথা এই যে, খাদ্যাভাবে তাঁর শরীর একেবারেই অচল হয়ে গেছে।

নবীজী বললেন,—"তোমার থেকে আমার মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশী। কিন্তু আজ তিন দিন আমি উপোস আছি। তাঁর কাছে আমি যা প্রার্থনা করি, তিনি আমাকে তাই দেন। কিন্তু আমি এ দুনিয়ার সুখের জীবন থেকে পরকালের জীবনকে মনোনীত করে নিয়েছি। তুমি এ দুনিয়ার সব রমণীদের শ্রেষ্ঠ; সুতরাং দুনিয়ার এ দুঃখে তোমার বিচলিত হওয়া উচিত নয়।"

হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে,—"একদা নবী দুলালী নামায শেষ করে চিন্তাযুক্ত ভাবে জায়নামাযের ওপর বসেছিলেন। তাঁর চোখ থেকে পানি পড়ছিলো। এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিতরে এসে দেখতে পেলেন,—মা যোহরার মুখভাব উদাস—চোখের পাতা ভেজা ভেজা। তিনি এ অবস্থার কারণ জানতে চাইলে তিনি তার জবাবে বললেন,—হঠাৎ আমার মনে আমাদের অভাব-দারিদ্র্য ও কষ্টের চিন্তার উদয় হয়েছিলো, তাই একটু উদাসিন হয়ে পড়েছিলাম।

নবীজী তাঁর একথা শুনে বললেন,—ফাতেমা তোমার জায়নামাযের একটা কোণ উল্টিয়ে দেখ।

নবী নন্দিনী জায়নামাযের কোণ উল্টিয়ে দেখতে পেলেন, সোনা এবং রূপার দুটো নদী সবেগে বয়ে চলেছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন,—'বাছা তুমি তোমার ইচ্ছামত সোনা-রূপা নিয়ে ভালো খাও-পরো, দালান-কোঠা তৈরি কর, বাগ-বাগিচা, দাস-দাসী নিয়ে এ দুনিয়াকে ভোগ করো। কিন্তু মনে রেখো,—এসব নিতান্তই অস্থায়ী।

ফাতেমা পিতার কথা শুনে খুব লজ্জা পেলেন।

তিনি বললেন,—আব্বাজান! দুনিয়ার সুখভোগ করার ইচ্ছে আমার নেই। এ কথা বলে তিনি জায়নামাযের কোণ সোজা করে দিলেন।"

হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইবাদাত

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে জানা যায়, তিনি বলেছেন,—"নবী নন্দিনী ইবাদাতের দিকে এমনই মযবুত ছিলেন যে, সারা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন।"

হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,—নবীজীর হুকুম মতো আমি একবার মা খাতুনে জান্নাতের বাড়ীতে গেলাম। ছেলে ঘুমোচ্ছিল, তিনি হাত দিয়ে তাকে পাখা করছিলেন এবং মুখে কুরআন আবৃত্তি করছিলেন।

একবার বাইরে থেকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বাড়ীতে এলেন। এসে দেখতে পেলেন, মা ফাতেমা রুটি তৈরী করছেন,—কিন্তু মুখে তাঁর পবিত্র নাম।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বর্ণনায় দেখা যায়,—তাঁর সারা জীবন মেহনত আর ইবাদাতে কেটে গেছে। যখন কুরআনে জাহান্নামের আযাব সম্বন্ধে আয়াত অবতীর্ণ হয়—তখন নবীজী কাঁদতে লাগলেন। সাহাবীগণও ঐ ক্রন্দনে যোগদান করলেন ; কিন্তু এ ক্রন্দনের কারণ কেউ নির্ণয় করতে পারছিলেন না। সাইয়েদা ফাতেমা যোহরাকে দেখলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মন শান্ত হতো, এজন্য তাঁকে খবর পাঠানো হলো। পিতার কান্নার খবর পেয়ে তিনি মসজিদে এলেন। দশ বারো জায়গায় তালি দেয়া একখানা কম্বলে তাঁর পবিত্র শরীর ঢাকা ছিল। কয়েকজন সাহাবী নবী নন্দিনীর এ অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললেন।

হযরত ফাতেমা যোহরা নবীজীকে বললেন—আব্বাজান! আপনার কান্নার কারণ কি ?

জাহান্নামের আযাবের যে আয়াত নাযিল হয়েছিলো নবীজী তা তাকে পড়ে শোনালেন। হযরতের প্রিয় কন্যা ঐ আয়াত শুনে চেতনা হারিয়ে ফেললেন। চেতনা ফিরে আসার পর পুনঃ পুনঃ ঐ আয়াত পড়ে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

এ সময় আল্লাহপাক তাঁর করুণা সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করলেন। নবীজী তখন আল্লাহর করুণা স্মরণ করে তাঁরই সিজদায় নিপতিত হলেন।

'আল-লশরাহ' প্রণেতা হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন,—"আমার মাতা সাইয়েদা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত সমস্ত রাত আল্লাহর কাছে রোদন করতে দেখেছি। তাঁকে খুব বিনয়ের সাথে কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেও শুনেছি। কিন্তু এ প্রার্থনায় একবারও তিনি আল্লাহর কাছে নিজের জন্য কিছু চাননি।"

তবকাতে ইবনে সা'দে বর্ণিত আছে,—"তাঁদের শরীর ঢাকবার চাদর এতটা ছোট ছিলো যে, যখন তাঁরা গা ঢাকবার চেষ্টা করতেন তখন মাথা ঢাকা যেত না। আবার যখন মাথা ঢাকবার চেষ্টা করতেন, তখন পা ঢাকা যেত না।"

ইমাম গাযালীর এহইয়া-উল-উলুম গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, —একবার নবী নন্দিনী ভীষণভাবে পীড়িত হয়ে পড়লেন। কিন্তু এ অবস্থায়ও তিনি সারারাত আল্লাহর ইবাদাতে কাটালেন। ভোর বেলা যখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ফজরের নামায আদায়ের জন্য মসজিদে গেলেন তখন মা ফাতেমাও উঠে নামাযে দাঁড়ালেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদ থেকে ঘরে ফিরে দেখতে পেলেন, মা খাতুনে জান্নাত যাতা পিষছেন। তিনি এ দৃশ্য দেখে বললেন, হে রাসূলের স্নেহভাজনীয়া! এত পরিশ্রম থেকে বিরত থাক, একটু বিশ্রাম কর। নতুবা তোমার পীড়া গুরুতর হয়ে উঠতে পারে।

নবী নন্দিনী আরজ করলেন,—এ দুটো কাজ এতো গুরুভার নয় যে, এতে পীড়া বৃদ্ধি পেতে পারে। এক-আল্লাহর ইবাদাত, দুই-আপনার খেদমত। এতো আমার সব রকম পীড়ার ওষুধ। এ কাজে যদি আমার মরণও হয়, তাহলে এ রকম মরণ অপেক্ষা এমন কি আছে, যা আমার কাম্য হতে পারে? এ রকম কাজে হাজার জীবন উৎসর্গ করাও উত্তম।

নবী নন্দিনী হযরত ফাতেমা যোহরা সম্বন্ধে নানা কথা

মুসলিম জগতের নারীকুল শিরোমণি জগজ্জননী আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রায় বলতেন,—"হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চয় দোষ-ত্রুটিহীন ছিলেন। এছাড়া নবী নন্দিনী ফাতেমার মত সত্যবাদিনী আমি আর কাউকে দেখিনি।"[১]

অন্যত্র দেখা যায়,—"হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে আল্লাহর রাসূল যদিও সকলের চেয়ে বেশী ভালোবাসতেন,—কিন্তু সে ভালোবাসা এজন্য নয় যে, হযরত ফাতেমা দুনিয়ার কোনো বিষয়ে তাঁর দ্বারা লাভবান হন, বরং সে রকম চেষ্টাও তিনি করেননি।"[২]

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মা খাতুনে জান্নাতকে বলতেন, "তুমি যার প্রতি সন্তুষ্ট থাক, তার প্রতি আল্লাহও সন্তুষ্ট থাকেন এবং তুমি যার প্রতি অসন্তুষ্ট হও, আল্লাহও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।"[৩]

আল্লাহর উপদেশ রাসূল দিচ্ছেন,—হে স্ত্রীলোকগণ! তোমাদের অনুকরণের জন্য দুনিয়ার নারীগণের মধ্যে ইমরান কন্যা মারইয়াম, খুওয়াইলিদ কন্যা খাদিজা, মুহাম্মাদ কন্যা ফাতেমা ও ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া সর্বোত্তম আদর্শ।"[৪]

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেন, "উঠা-বসা ও স্বভাব-চরিত্রে, কথার ধরনে, ঠোঁটের গঠনে, গলার আওয়াজে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মা খাতুনে জান্নাতের যে রকম মিল ছিলো, তাঁর সাথে এসব দিক দিয়ে তেমন সাদৃশ্য আর কারোই ছিলো না।"

হযরত ফাতেমা যোহরা যখনই রাসূলের নিকট আসতেন তখনই তিনি (তাঁর সম্মানার্থে) উঠে দাঁড়াতেন, (স্নেহার্থে) কপালে চুমু দিতেন,

---

১. ইসতিয়াব। ২. আবু দাউদ। ৩. উদ্‌দুল গাবাহ। ৪. তিরমিযী।

নিজের বসবার জায়গায় তাঁকে বসাতেন। হযরত ফাতেমাও অনুরূপ ব্যবহার করতেন।[১]

পরবর্তীকালে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রায়ই বলতেন,—"যখন নবী দুলালী ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে আমার বিয়ে হয়, ঐ সময় তাঁকে শুতে দেবো এ রকম কোনো বিছানাও আমার ছিলো না। একটা চামড়ার মোশক ছিলো। দিনে ঐটায় পানি আনতাম, রাতে ঐটার উপর ঘুমোতাম। এমন কি তখন আমার একটা গোলামও ছিলো না।"

হিজরী তৃতীয় বর্ষে এ দুনিয়ার বুকে ফুটলো জান্নাতের ফুল। হযরত ইমাম হাসান ভূমিষ্ঠ হলেন। চতুর্থ বর্ষে এলেন হযরত ইমাম হোসাইন। নবী দুলালীর সন্তান-সন্ততি সাইয়েদ নামে প্রসিদ্ধ। সাইয়েদ অর্থ শ্রেষ্ঠ। ইমামদ্বয়ের মাতার আল্লাহ-পরায়ণতায়, ইবাদাতে, হৃদয়ের উদারতায়, গরীব-দুঃখির প্রতি দয়ায়, পিতৃভক্তি, সংসার নির্লিপ্ততা ও স্বামী ভক্তির পুণ্যফল বলে তাঁরা এবং তাঁদের সন্তানগণ সর্বদেশে সর্বযুগে সম্মানিত। যে ফুলের গাছে সুরভিযুক্ত ফুল ফোটে, মানুষ সেখানে তাই আশা করে।

নবী নন্দিনী থেকে অনেক হাদীস পাওয়া গেছে। মুসলমান নারীদের কি রকম স্বামী ভক্তি ও নবী ভক্তির পরিচয় দিতে হবে, কিভাবে ইসলামী কানুন পালন করে আল্লাহভীরু মহিলা পর্যায় উন্নীত হতে হবে তারই কিঞ্চিত নির্দশন নীচে দেয়া হলো ঃ

মা খাতুনে জান্নাত বলেছেন, —একদা আল্লাহর রাসূলের কাছে আমি বসে আছি, এমন সময় একজন বাঁদী এসে আরজ করতে লাগলো,—আমার মালিক বাণিজ্য সফরে গেছেন, আমার মনিব গিন্নি একাই ঘরে আছেন। তিনি ঐ বাড়ীর ওপর তলায় থাকেন, নীচের তলায় বুড়ো বাপ-মা থাকেন। মনিব বিদেশে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে নসিহত করে গেছেন; তিনি যেন তার ফিরে না আশা পর্যন্ত ওপর থেকে নীচের তলায় না নামেন। কিন্তু এখন আমার মনিব-পত্নীর পিতা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত। আপনি যদি বলেন, তবে তিনি ওপর থেকে নীচে নেমে এসে পিতার খেদমত করতে পারেন।

---

১. আসাবা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাঁদীর মুখে সব কথা শুনে বললেন, তোমার মনিবের স্ত্রীকে বলে দাও, যে পর্যন্ত তার স্বামী সফর থেকে ফিরে না আসে সে পর্যন্ত যেনো সে নীচতলায় না নামে।

বাঁদী চলে গেলো।

পরক্ষণেই আবার সে ফিরে এসে কাতর ভাবে জানালো ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মনিবের স্ত্রীর পিতা এখন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছেন। যদি এখনও আপনি দয়া করে হুকুম দেন, তবে নীচে এসে পিতার অন্তিম সেবা করতে পারে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,—দেখ যদি তোমার মনিবের স্ত্রী আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রীতি প্রার্থনা করে, তবে তার পিতা মারা গেলেও স্বামীর বিনা হুকুমে নীচতলায় নামা উচিত নয়।

কিছুক্ষণ পর পুনরায় ঐ বাঁদী ফিরে এসে আল্লাহর রাসূলকে জানালো,—হুজুর পিতা মারা গেছেন, এবার মাতাও মৃতপ্রায়। যদি এখন আপনার হুকুম হয়, তবে মায়ের সাথে অন্তত শেষ দেখাটা তিনি করতে পারতেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথার জবাবে জানালেন,—হে বালিকা ! তুমি ভালোভাবে শুনে রাখো, যে পর্যন্ত তার স্বামী এসে অনুমতি না দেয়, সে পর্যন্ত যাই ঘটুক না কেন, কোনো ক্রমেই তার নীচে নামা উচিত হবে না। তাকে গিয়ে বল,—আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও স্বামীর আদেশ মত সে কাজ করুক,—এজন্য সে পুরস্কার পাবে। এই ঘটনার পর দুসপ্তাহ পার হয়ে গেলো।

আমি (আল্লাহর রাসূল) ঐ বাঁদীকে তার মনিবের স্ত্রীর বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। জবাবে সে বললো,—হে রাসূল! বিবির মা-ও ঐ দিনই মারা গিয়েছিলেন। দুদিন পর তার স্বামী বাড়ী এলেন। সব ঘটনা শুনে তিনি খুবই দুঃখিত হলেন। কিন্তু যখন শুনতে পেলেন, তাঁর বিবি আল্লাহর রাসূল এবং নিজের স্বামীর হুকুমের বাইরে যায়নি, তখন স্ত্রীর প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হলেন।.....

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা বর্তমান যুগে বড়ই জটিল হয়ে পড়েছে। এখন আমরা বুঝি না যে, আদেশ পালনের মধ্যেও এক ধরনের মাধুর্য নিহিত রয়েছে। সেকান্দর বা নেপোলিয়ানের মত বীর পুরুষও সেকালে মায়ের আদেশ শিরোধার্য করেছেন। আর আজ ! এ দুর্দিনে যে দিকে তাকাই শুধু শূন্যতাই দেখতে পাই। যারা এখন এ পৃথিবীর ক্ষমতা দখলকারী তাদের কাছে নিজের শক্তিগর্ব বড় প্রিয়। তারা জানে কি করে শাসন করতে হয়, শোষণ করতে হয়। জানে না, শুধু কি করে আদেশ পালন করতে হয়।

সেই বাঁদীর কাহিনী আরো এগিয়ে চললো.....

আদেশ পালনকারিণী সওদাগরের বিবি স্বপ্নে দেখলেন— রাতে এক মণি-মুক্তা খচিত ভবনে বসে আছেন তাঁর পিতা মাতা। জান্নাতের কোনো আয়োজন তারা এ দুনিয়া থেকে করে যাননি। কারণ তাঁরা আল্লাহর রাসূলের প্রতি তত শ্রদ্ধাবান ছিলেন না।

সুতরাং নিশিথ স্বপ্নে আশ্চর্যন্বিত কন্যা জান্নাতবাসী পিতা-মাতাকে প্রশ্ন করলেন,—এ কি ব্যাপার ? কোন্ পুণ্যফলে এ দশায় উন্নীত হয়েছ তোমরা? বেহেশতের হুরগণ কোন্ গুণে তোমাদের খেদমত করছে ? দুনিয়ায় তো তেমন কিছু করনি।

জবাব এলো,—পুণ্য আমাদের নয় কন্যে, পুণ্য তোমার। কি সৌভাগ্য যে, তোমার মত কন্যার পিতা-মাতা হতে পেরেছিলাম! তোমার আল্লাহ, রাসূল ও স্বামী-প্রীতির পুরস্কারই আমরা ভোগ করছি।

পিতা-মাতার সুকৃতির ফলাফল যেমন পুত্র-কন্যার তেমনি পুত্র-কন্যার সুকৃতির ফলাফলও পিতা-মাতার প্রাপ্য। দুনিয়ায় এ নিয়মই চলে আসছে।

আমাদের নবীর পদ-গৌরব যে কত উচ্চে তার ধারণা করা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন। হযরত ফাতেমা যোহরা বর্ণনা করেছেন,—একদিন এক বাগানে কতগুলো ছাগল চরছিলো। আল্লাহর রাসূলকে দেখে তারা সেজদা করতে লাগলো। তাঁর সাথে যেসব সাহাবী ছিলেন, তাঁদের একজন বললেন,—যদি হুজুরের হুকুম হয় তা হলে আমরাও আপনাকে সেজদা করি।

তার কথার জবাবে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হে আদম সন্তান! যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সেজদা

করা দোষণীয় না হতো, তাহলে আমি প্রত্যেক স্ত্রীলোককে তার স্বামীকে সেজদা করার হুকুম দিতাম।"

স্ত্রীর কাছে স্বামীর মর্যাদার আসন কত উর্ধে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তিতে তা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো। এ উক্তিকে কেন্দ্র করে আজ অনেক কিছুই বলা যেতে পারে। মানুষের প্রতি মানুষের মর্যাদাবোধ শুধু মুখের কথা নয়, তার অন্তরের আসনে অক্ষয় হয়ে থাকে এ অনুভূতি। যদি মন না চায় ? কৃত্রিমতার রঙ চড়িয়ে কতদিন ধরে তাকে রক্ষা করা চলে। কৃত্রিমতা, কপটতা একদিন না একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে। সুতরাং এ কপটতার যুগে উপরের ঐ কথাটা কতখানি কার্যকরী, সে-ও ভাববার বিষয় বটে !

যারা নবী নন্দিনীর সমবয়স্কা ছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে একজন একদিন তাঁকে প্রশ্ন করলেন,—যদি কারো চল্লিশটা উট থাকে, তবে গরীবদের জন্য কয়টা যাকাত দিতে হবে ?

তিনি বললেন,—যারা তোমাদের ন্যায় সাধারণ স্তরের তাকে একটা মাত্র উট দিলেই চলে। কিন্তু যারা কাজে ও কথায় আমাকেই অনুসরণ করে থাকে, তাকে নিঃশেষে সবই বিলিয়ে দিতে হবে।

বিশ্ববাসীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার আল্লাহর পথে দান করার জন্য নিজের সব কিছুই আল্লাহর রাসূলের হাতে তুলে দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্ন করলেন,—নিজের পোষ্য পরিজনবর্গের জন্য কি রেখেছ ?

তিনি অম্লান বদনে জবাব দিলেন,—আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই তাদের জন্য যথেষ্ট। তাঁরাই তাদের খোঁজ-খবর নেবেন।

এমন জ্বলন্ত বিশ্বাস যে হৃদয়ে, তার আবার বাধা কোথায়? পৃথিবীর ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুঃখ-দুর্দৈব সব কিছুকে জয় করে এ হৃদয় যে কোনো দূরত্বকে অতিক্রম করতে পারে,—এ বিশ্বাসের কাছে মাথা নত না করে উপায় আছে কি ?

"হায়া বা লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ-স্বরূপ।"

নবী নন্দিনী মা খাতুনে জান্নাতের তা পরিপূর্ণ মাত্রায়ই ছিলো। মৃত্যুর পর তাঁর দেহ যাতে কারো গোচরীভূত না হয় এজন্য তাঁর সাবধানতার

অন্ত ছিলো না। পর্দার ভিতরে করে যাতে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, এ ছিল তাঁর শেষ অসিয়ত।

নবী নন্দিনী রাত্রিকালে ইন্তেকাল করেন। আর ঐ সময়ও তাঁর পর্দা সম্বন্ধে ছিল এতখানি কঠোরতা। জানি না,—বর্তমান সভ্যতা আমাদের কোন্ দিকে নিয়ে চলেছে। লজ্জা ছাড়া ঈমানের পরিপূর্ণতা আসতে পারে—অন্তত এ বিশ্বাস এখনও করতে ইচ্ছে হয় না। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে,—আল্লাহর রাসূলের হৃদয় কুমারী কন্যার মত লজ্জাশীল ছিল।

এ লজ্জার ভূষণ আজ খসে পড়েছে। ইসলামের বিজয় বৈজয়ন্তী যারা উড়াচ্ছেন তাঁরা অনৈসলামিক তখতের ওপর সওয়ার হয়ে শূন্যে উড়ে চলেছেন।

"তুলি লহ লজ্জার ভূষণ, যদি তুমি সত্য চাহ, চাহ পবিত্রতা। শোন সারকথা! কোথায় লজ্জার উৎস কর অন্বেষণ।"

এটা খুবই খাঁটি কথা—লজ্জাহীন, শরম-সংকোচহীন অর্বাচীন যারা, কোন্ স্পর্ধায় তারা ইসলামের অনুসারী হবার দাবী করতে পারে? অর্থ এবং ক্ষমতার প্রভাবে কাউকে আচ্ছন্ন করে যে কোনো একটা বাণী নিতে পারলেই কুকর্ম সুকর্মের দরে বাজারে বিকিয়ে গেলো, এটা মনে করা সহজ, কিন্তু সে কি সত্যই কোনো ধর্ম বা মঙ্গলের আকর? আমার স্বার্থ-সুবিধার জন্য ধর্মই আমার দিকে এগিয়ে আসবে, না আমাকেই ধর্মাভিমুখী হতে হবে, কোন্‌টা? কিন্তু দুঃখের বিষয় ইসলামকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অধুনা দুনিয়ার ইসলাম প্রেমিকদের নানা রকম প্রচেষ্টার বিষয় সুবিদিত। অনেকে আজকাল পর্দা ভেঙে বাইরে বেরুনোকে পরম গৌরবের বিষয় বলে মনে করেন। প্রশ্ন হচ্ছে, তারা কি প্রকৃতই আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর প্রিয় পরিজনের আদর্শকে অনুসরণ করা কর্তব্য মনে করে থাকে? নিশ্চয়ই এ কথার জবাব হবে— 'না'। এখন তা হলে স্পষ্টই বোঝা যায়, আল্লাহর রাসূলের প্রজ্ঞা থেকে তারা নিজেদের নিশ্চয়ই বেশী জ্ঞানী মনে করে, —যার ফলে তারা তাঁর প্রদর্শিত পথকে কল্যাণময় মনে করে না।

এখন বাকী রইলো,—তবুও কি তারা সত্যিকার মুসলমান ? আশা করি, এ প্রশ্নের জবাব পাঠক-পাঠিকাগণ নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারবেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন এবং আবু নাঈম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন,—"কিয়ামতের সময় আমিই সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হবো। অতপর ঘোষিত হবে, হে পুনরুত্থিত আদম সন্তানগণ ! তোমরা চোখ বন্ধ কর,—নবী নন্দিনী ফাতেমা যোহরা পুলসিরাত পার হবেন। যখন তিনি ঐ সেতু পার হতে থাকবেন, তখন তাঁর শরীর সবুজ রঙের দুখানা চাদর দ্বারা ঢাকা থাকবে।"

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরেই হযরত ফাতেমা যোহরা সর্বোচ্চ বেহেশতে প্রবেশ করবেন।" দুনিয়ার দীনাতিদীন যিনি—সারা জীবন ক্ষুধা এবং দৈন্য ছিল যাঁর সঙ্গী,—অথচ তারা পারলৌকিক মর্যাদা কত উপরে, তা চিন্তা করলে অবাক না হয়ে পারা যায় না।

এখানে আকাশচুম্বী অট্টালিকা, রাজকীয় সমারোহ, ঐশ্বর্যের চাকচিক্য নিয়ে আদম সন্তানরা মত্ত হয়ে আছে। তাদের বিশ্বাস ক্ষীণ। মনের ভাবখানা,—যদি প্রবঞ্চিত হই, যদি পরকাল ফাঁকাই যায়, তবে এ কালটা হাতের মুঠো থেকে ফসকে যাবে কেন ?

কথাগুলো খুবই নিষ্ঠুর। কিন্তু এখানে না বলে উপায় নেই। বিশ্বাসের মধ্যে প্রতারণার স্থান কোথায় ? সত্যের সাথে মিথ্যার রফা কি ভাবে হতে পারে ? যে সত্যের প্রতিষ্ঠা হেতু একদিন ইসলাম দুনিয়ায় আবির্ভূত হয়েছিলো, আজ সে নেই। কতগুলো কংকাল 'ইসলাম' 'ইসলাম' করে একটা মরা লাশকে আগলে নাচানাচি করছে।

পিতৃ বিয়োগ

মহীয়সী মা ফাতেমা সম্পূর্ণ সংসার-নির্লিপ্ত ছিলেন, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। মুসলিম মহিলাকুলকে তিনি তাঁকে অনুকরণ করতে আদেশ দিয়ে গেছেন। চিন্তায়, আদর্শে, কর্তব্য এবং প্রেরণায় যারা প্রকৃত মুসলমান, তাদের কাছে এর আবেদন কত গভীর তা বেশ সহজেই বুঝা যায়।

আল্লাহর রাসূল ছিলেন এ মহীয়সী মহিলার পিতা।

সারা দুনিয়ায় মানবতার প্রভাবের জন্য মানব সমাজের ভ্রান্তি ও নৈকট্য দূর করার জন্যই তিনি এ দুনিয়ায় এসেছিলেন। আল্লাহর নির্দিষ্ট ও আদিষ্ট পথে ইসলাম প্রচার করে তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে প্রত্যাগমন করেন।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

শেষ নবীর প্রতি,—আল্লাহর শেষ বাণী বাহকের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক !

একাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাস। বিদায়ের পয়গাম এলো। এলো প্রিয় বিচ্ছেদের শোকগাথার দিন। দুনিয়ায় থাকতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে অত্যধিক স্নেহ করতেন, বিদায়কালে তাঁকে নিজের পাশে ডেকে পাঠালেন।

হযরত ফাতেমা যোহরা এলেন। তাঁর চোখ দুটো আশ্রুসজল। দুনিয়ার বুকে এক স্নেহময় পিতাই ছিলেন তাঁর সম্বল। তাও তিনি বিদায় নিয়ে চিরদিনের মত চলে যাচ্ছেন। পিতা কন্যার কানে কানে কথা বললেন—মা খাতুনে জান্নাতের কান্নার বেগ বেড়ে গেলো। পুনরায় তিনি সস্নেহে কন্যার কানে কানে যেনো কি কথা বললেন,—অমনি তার ওষ্ঠাধর প্রান্তে ফুটে উঠলো মধুর হাসি!

ব্যাপার দেখে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা খুব বিস্ময় বোধ করলেন। তিনি মা খাতুনে জান্নাতকে তাঁর হাসি কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন,—আমি আল্লাহর রাসূলের রহস্য প্রকাশ করতে পারি না।

ওফাতের পর হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তিনি বলেন,—প্রথমে আল্লাহর রাসূল তাঁর কানে কানে বলেছিলেন,—তিনি শীঘ্রই দুনিয়া ছেড়ে যাচ্ছেন,—এ ছিল তাঁর কান্নার কারণ। পরে আবার তিনি তাঁর কানে কানে বলেন,—সবার আগে তিনিই তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবেন। এ ছিলো তাঁর হাসির কারণ।

পিতার বিচ্ছেদ বেদনা মা খাতুনে জান্নাতকে বড়ই ব্যথাতুর করে তুললো। তিনি এ ঘটনার পর যতদিন দুনিয়ায় ছিলেন কেউ তাঁর মুখে হাসির লেশটুকু পর্যন্ত দেখেনি। তিনি প্রায় সব সময়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযায় গিয়ে অশ্রু বিসর্জন করতেন।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে বহুদিন আগেকার একটা ঘটনা। মক্কার কুরাইশ দুশমনদল তখন আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণে কোনো কিছু করতেই পশ্চাদপদ নয়। আবু জাহল কুরাইশ পক্ষের প্রধান দলপতি। আল্লাহর রাসূলকে নির্যাতনের জন্য এমন কোনো কাজ ছিলো না যা সে করতো না।

হারাম শরীফে নামায পড়ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আবু জাহল এ সময় চীৎকার করে তার দলবলকে বললো,—তোমাদের মধ্যে কোন্ বীর ঐ গলিত উটের নাড়িভূঁড়িগুলো মুহাম্মাদের মাথায় ফেলে আসতে পারো?

ওকবা নামক এক তরুণ দাঁড়িয়ে উঠে বললো,—আমি এখনই এ কাজ করে আসছি।

পঁচা-গলিত দুর্গন্ধময় নাড়িভূঁড়িগুলো ওকবা উঠিয়ে নিয়ে সেই পবিত্র পুরুষের সেজদা নত কাঁধের উপর রেখে দিলো। কি বর্বরতা!—কি পৈশাচিকতা! মানুষকে লাঞ্ছনা দেয়ার বা হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য মানুষ কি কোনোদিন এমন অমানুষিক পথ ধরতে পারে?

হযরত খাদিজা বেঁচে নেই। চাচা আবু তালিবও দুনিয়ার মায়া কাটিয়েছেন।

অতএব সবাই তাঁকে অবলম্বনহীন মনে করে আরো বেশী রকম পীড়ন করছে। খবর পেলেন, নবী নন্দিনী। কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলেন

তিনি। দেখতে পেলেন, তাঁর স্নেহময় পিতা শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ে আছেন সেজদায়। উটের গলিত নাড়িভূঁড়ির স্তূপ তাঁর কাঁধের উপর।

তিনি নিজের হাতে সেগুলো পরিষ্কার করতে লাগলেন। কুরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন,—আমার আব্বাজান নির্দোষ, নিরীহ, তাঁকে কেন তোমরা এভাবে নির্যাতন করছো?

মা যেমন তাঁর হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে খুঁজে পেয়ে ঘরে ফিরেন,—তেমনি ভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে করে ঘরে ফিরলেন মা খাতুনে জান্নাত।

পিতা-কন্যার এই অচ্ছেদ্য স্নেহ বন্ধন ছিঁড়ে গেলো রাসূলে খোদার ইন্তেকালে। মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা পিতার রওযার পাশে গিয়ে প্রায়ই শোকগাথা আবৃত্তি করতেন।

মা খাতুনে জান্নাত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে তার ঘ্রাণ নিতে নিতে বলতেন ঃ

"তাঁর পবিত্র সমাধি এই মাটি,
এই মাটিতে স্বর্গীয় সুরভি বেরোচ্ছে—
যে এই মাটির সুগন্ধ গ্রহণ করবে,
সে দুনিয়ায় যত দিন বেঁচে থাকবে,
অন্য কোনো সুগন্ধের আঘ্রাণ
নেবে না—নেবে না—নেবে না।
আমার উপর যা আপতিত হলো,
তা যদি সূর্যের উপর পড়তো,
তাহলে এ জগত চির অন্ধকারে ভরে যেতো।
কখোনো এ জগতে পুনরায় আলোক,
ফেরেশতা, জিন, পরী বা মানুষ,
আর কেউ দেখতে পেতো না।"

—দুররুল মনসুর

নীচের এ মর্সিয়াটি হযরত ফাতেমা যোহরা রচিত, এটাও 'দুররুল মনসুরে'র মত। মর্সিয়াটি সত্যই শোক প্রকাশক ছন্দে লেখা ঃ

"আকাশ-গর্ভ ধূলিকা পূর্ণ,
সূর্য হলো কিরণ শূন্য,
জ্যোতিষ্ক সকল হলো মলিন,
ভূতল শোকেতে হলো পূর্ণ।
হলো যে তাহা শতধা চূর্ণ।
পূরব-পশ্চিমে শোকার্ত আমীন,
মিসরে আর ইয়ামনে সবে,
ফুরাইলো দিক ক্রন্দন রবে;
পর্বতে পর্বতে প্রান্তরে প্রান্তরে,
উঠিলো ভয়ে কাঁদিয়া সবে,
প্রলয় যেনো এখনই হবে,
বিচ্ছেদ-আঘাত অন্তরে অন্তরে।।
ধরাতে আর হবে না পুনঃ,
রাসূল নব আগত কোনো,
ওহী যে নিঃশেষ তোমাতে হলো।
সালাম হউক তোমার উপর,
সহস্র বার ওহে নবীবর,
আমীন—আমীন ফেরেশতা বলিল।।"

নবী বংশের এ কবি প্রতিভা যেনো অল্লাহর দান। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা সুকবি ও সুবক্তা ছিলেন। হযরত ফাতেমা যোহরা কবিত্বের দিক দিয়ে খ্যাতির অধিকারিণী ছিলেন।

হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার মধ্যে যেন ইসলামের সব গুণ মূর্তরূপ পরিগ্রহ করেছিলো। একাধারে তিনি ছিলেন দুনিয়ার মুসলিম মহিলাদের আদর্শ এবং আল্লাহর রাসূলের ইহ-পারলৌকিক উত্তরাধিকারিণী।

ইসলামের স্বর্ণ যুগের এসব রত্ন আজ আর নেই। পিতৃহারা অনাথ সমাজ শুধু সেই অতীতের সৌরভ আঘ্রাণ করেই এগিয়ে চলছে। তাই মহা কবি আল্লামা ইকবালের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে বিষাদের এক করুণ সুর। 'জওয়াবে শিকওয়ার' প্রতি ছত্র সেই ব্যথায় রঙীন হয়ে উঠেছে ঃ

"উঠে শোর আজ ধরণী বক্ষে
মুসলিম আর নাহিক হায়,
শুনে হাসি পায় নাহিক এখন,
কবে মুসলিম ছিলো ধরায় ?
রীতি-নীতি তব খৃষ্টান সম
হিন্দু তো তুমি সভ্যতায়,
এই কি হে সেই মুসলিম যারে
ইহুদীও দেখে লজ্জা পায় ?
মুখে বল তুমি মির্জা সৈয়দ
মহা তেজস্বী বীর পাঠান,
সব কিছু তব হওয়া সম্ভব,
নহ শুধু তুমি মুসলমান!
কোথা সে একতা শুধু দল ভেদ
নাহিক অভাব জাতি ভেদের।
দুনিয়ায় তবে উন্নতি লাভ
কিসে হবে বল মুসলিমের ?"

কবির এ উক্তি যে কত সত্য, একবার গভীরভাবে বর্তমান সমাজকে লক্ষ্য করলেই তা বেশ বুঝতে পারা যায়! একদা মুসলিম জাতি গৌরবের কোন্ উচ্চতম শিখরে ছিলো এবং কেন ছিলো,—আজ কেন তা নেই—এসব বুঝা খুব কঠিন নয়। আজ আমাদের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান যেভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে, তাতে উত্তরকালে এ দেশে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়ার মতো একটি প্রাণীও অবশিষ্ট থাকবে কিনা সন্দেহ! আল্লামা ইকবালের ভাষায় ঃ

"আসিলে সময় পূত নামাযের চলিতেছে যবে ঘোর সমর,
কাবা মুখী হয়ে চুম্বিত মাটি হেজাজের বীর বংশধর!
বাদশাহ মাহমুদ ভৃত্য আয়ায দাঁড়াইতো দোঁহে এক কাতার
কেহ গণিত না ভৃত্য কাহারে,—প্রভু রহিত না কেহ কাহার
আমীর-ফকীর-বাদশা-নফর, ক্ষুদ্র-মহতে অভেদ জ্ঞান,
তোমার মহান দরবারে আসি হইত সকলে এক সমান !
মুসলিম জাতির পূর্ব ইতিহাস তো এই রূপই !

যে তেজে,—যে গৌরবে উদ্দীপ্ত হয়ে একদিন মুসলিম জাতি সারা বিশ্ব জয়ের ক্ষমতা অর্জন করেছিলো,—সে শক্তির উৎস মুখের সন্ধান দিয়েছেন মুসলিমদের জাতীয় কবি আল্লামা ইকবাল।

এক স্থানে কবি বলেছেন,—

"ভোগের সুরায় মত্ত সদাই,
হৃদয়ে পূর্ণ বিস্মৃতি,
আপনারে তুমি বল মুসলিম,
ছিল কি তাদের হেন রীতি ?
নাহিক তোমার হায়দরী ত্যাগ,
বিত্ত নাহিক ওসমানের।
পিতৃ-পুরুষ সংগে নাহিক
চিহ্ন আত্মা-সংযোগের।।"

পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার সবদিক দিয়েই আজ মুসলিম জাতি 'মুসলিম' নামের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। যে বরণীয় বিশ্ব-জননী, পূত চরিতা মহিলার কথা এখানে আলোচনা করছি, তাঁর দর্শন বুঝতে পারে,—এমন মুসলমান কজন আজ দুনিয়ায় অবশিষ্ট আছে ?—মা খাতুনে জান্নাত জান্নাতের যে পথ দেখিয়ে গেছেন, সে পথে চলার মত নারী কোথায় ?—যতদিন সে রকম রমণীর আবির্ভাব না হবে—ততদিন দুনিয়ার বুকে সত্যিকার মুসলমানের জন্মও সম্ভব হবে না !

হযরত ফাতেমা যোহরার ইন্তেকাল

"নীল কবুতর লয়ে নবীর দুলালী মেয়ে
খেলে মদীনায়
দেহের জ্যোতিতে তার জাফরানী পিরহান
ম্লান হয়ে যায়!"
—কবির এ উক্তি খুবই সত্য।

প্রকৃতই মা খাতুনে জান্নাত নবীজীর দুলালী মেয়ে ছিলেন। তিনি পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণের সময় বলে গিয়েছিলেন,— সবার আগে 'তুমি আমার সাথে মিলিত হবে।'

তাই হলো। নবীজীর ওফাতের কয়েক মাস পরই তিনি মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে আল্লাহর আহবানে সাড়া দিলেন। মা খাতুনে জান্নাতের বিদায়ের দিন এ পৃথিবীর জন্য এক শোকাবহ দিন। তিনি যেনো এ আঁধার ধরণীর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন। তাঁর অন্তর্ধানে পৃথিবীর বুকে যেন সেদিন নেমে এলো চিররাত্রি।

হিজরী এগারো সাল। রমযান মাস। নবীজীর ওফাতের মাত্র ছয় মাস পর রাসূলের প্রিয় কন্যা এ পৃথিবীর মায়া কাটালেন। তাঁর পবিত্র আত্মা যেন পিতৃ আত্মার মহা সম্মিলন কামনায় দিবানিশি পথ পানে তাকিয়েছিলো।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনায় জানা যায়, হযরত ফাতেমা যোহরা যখন এ দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে পরপারে যাত্রা করেন, তখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পাশে ছিলেন না। তিনি হযরত উম্মে সালামাকে ডেকে গোসলের পানির বন্দোবস্ত করে দিতে বললেন। তারপর যে ধোলাই করা কাপড় ঘরে উঠানো ছিলো, তাই বের করে দিতে বললেন। তিনি নিজের খুশিমত গোসল করে সেই কাপড় পরলেন। অতপর হযরত উম্মে সালামাকে তিনি বিছানা করে দিতে বললেন। নবী দুলালী ঐ বিছানায় শয়ন করে বললেন—

"এখন আমার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসছে। আমার শরীর আমি ভালোমত ধুয়েছি,—আর কেউ যেনো আমার শরীর না ধোয়ায়—বা না দেখে।"১

১. তবকাত।

ইন্তেকালের আগেই মা খাতুনে জান্নাত আমীস দুহিতা হযরত আসমাকে বলেছিলেন, "মেয়েদের মৃতদেহ যাতে অন্যে দেখতে পায়, এমন বেপর্দা অবস্থায় জানাযা বা কবর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া আমার একটুও ভালো লাগে না।"

হযরত আসমা নবী দুলালীর এ কথার জবাবে বললেন,—"মৃতদেহ পর্দা করে নেয়ার প্রথা মিসরদেশে প্রচলিত। তারা চারটে খেজুরের ডাল খাটিয়ার চারধারে বেঁধে তার সাথে ভালো কাপড় ঝুলিয়ে দেয়।"

নবীকন্যা হযরত আসমার এ কথা শুনে খুবই সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর মৃতদহকেও ঐভাবে নিয়ে যেতে বলেন।২

মুসলিম মহিলাদের মধ্যে মা ফাতেমার মৃত দেহই প্রথম এভাবে পর্দার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলো। তখন থেকে মুসলিম জাহানে এ প্রথাই চালু হয়ে গেলো।

হযরত ফাতেমা তাঁর জীবদ্দশায় আর একটি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,—রাতে ইন্তেকাল হলে রাতেই যেন তাঁর জানাযা ও দাফন কাফনাদি শেষ করা হয়। তাঁর এ আদেশ মতই কাজ করা হয়। এ কারণে তাঁর জানাযায় বেশী লোক সমাগম হতে পারেনি।

হযরত আব্বাস নবী কন্যার জানাযা নামায পড়ান। হযরত আলী, হযরত ফযল ও হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম তিনজনই তাঁর লাশ কবরে নামান।

মা খাতুনে জান্নাতকে সমাহিত করার পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রিক্ত মনে বাড়ী ফিরলেন। তাঁর পৃথিবী যেনো অন্ধকারে হারিয়ে গেলো। তিনি নিজের মনেই আবৃত্তি করছিলেন ঃ

"সমস্ত ব্যায়ারাম হইলো আমার ,
যাবত জীবন নাহিক নিস্তার।
বন্ধুত্বে পার্থক্য ঘটে অবশেষে,
কঠিন ব্যায়ারাম শরীরে প্রবেশে।
গেলেন রাসূল, ফাতেমাও আর,
সব ব্যাধি যেনো হইলো আমার।"

২. উদুদুল গাবাহ।

নিজের অন্তরের দুঃখকে তিনি এভাবে কবিতার ছন্দে পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করছিলেন।

প্রতিদিন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই কবর দর্শনে যেতেন। আল্লাহর রহমত ও সালাম তাঁর উপর অবতীর্ণ হোক এই বলে প্রার্থনা করতেন। যখন তিনি কবরের পাশে বসে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতেন,—তখন তাঁর দুচোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তো।

"কেমন দুর্ভাগ্য হায়, হয়েছে আমার,
গোর হতে নাহি আসে উত্তর তাঁহার।
নিত্য আসি, নিত্য বলি সালাম তোমায়,
কেন নাহি দাও তুমি উত্তর আমায় ?
পূর্ব কথা হাসি তুমি গিয়াছ ভুলিয়া ?
না কর উত্তর তুমি সালাম শুনিয়া !"

কিন্তু এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে যিনি চিরদিনের জন্য চলে গেছেন, শত প্রিয়জনের আহবানেও কি আর তিনি ফিরে আসেন বা জবাব দেন ? হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিদিন ব্যথাতুর হৃদয়ে ফিরে আসতেন শূন্য ঘরে। হায়, কোথায় সেই প্রিয় পরিচিত মুখ!

হযরত ফাতেমা যোহরার কবরে নিম্নোক্ত লিপি রয়েছে ঃ

এটি নবী নন্দিনী হযরত ফাতেমা যোহরার কবর! তিনি জান্নাতের সমগ্র রমণীকুলের নেত্রী ও শ্রদ্ধাভাজন। মাননীয়া রমণীকুলের মধ্যে তাঁরই গর্ভধারিণী উম্মুহাতুল মু'মিনীন বিবি খাদিজা বিনতে খোওয়াইলিদ প্রথম দীন ইসলাম কবুল করেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবি ফাতেমা যোহরার পিতা, আলী মুর্তাযা তাঁর স্বামী, তরুণ দলের মধ্যে ইনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। ইনি আল্লাহর হাবীব রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সাহাবীও ছিলেন বটে। তাঁর সন্তান হযরত হাসান এবং হোসাইন শহীদগণের মধ্যে সর্বোচ্চ পদে সমাসীন। জান্নাতের যুবকগণের কাছেও এরা ভক্তির পাত্র। নবী নন্দিনী ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা স্বেচ্ছায় দুনিয়ার সব সুখকে পরিত্যাগ করেছিলেন, তিনি গুরুতর পরিশ্রম, যেমন যাঁতা পেষা, পানি

তোলা এসব ঘরের কাজ নিজের হাতে করতেন। জীবনকালে অনেকবার ইনি উপবাসে দিন কাটিয়েছেন। কিন্তু এজন্য তিনি কখনো বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার আর কাউকে এর চেয়ে বেশী ভালোবাসতেন না। তিনি যেমন রাসূলের প্রিয় তেমন আল্লাহরও প্রিয় ছিলেন। রাসূলের পর তাঁর গৃহবাসিনীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম মা ফাতেমা যোহরা এ দুনিয়া থেকে গিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হন। কারণ ইনি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল উভয়েরই সমান প্রিয় ছিলেন। এ কবরই ফাতেমা বংশীয়গণের তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার আশা কেয়ামত পর্যন্ত সঞ্জীবিত রাখবে। এ কবরই দুনিয়ার ক্লিষ্ট পাপ-তাপ দগ্ধকে কেয়ামত পর্যন্ত সান্ত্বনা দিতে থাকবে। সর্বগুণ মণ্ডিতা খাতুনে জান্নাত যা দেখিয়েছেন এরকম সহিষ্ণুতার আদর্শ আর কেউ দেখাতে পারেন না। সংসারের যত কষ্ট প্রশান্ত মনে এ নিষ্পাপ মহিলা বহন করে গেছেন। সেই রকম কষ্ট আর কেউ সহ্য করতে পারবে না। রোজ হাশর বা পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত তাঁর থেকে এ কবরের উপর প্রসন্নতা ও কল্যাণ অবতীর্ণ হোক।

নবী দুলালীর মৃত্যু বিচ্ছেদে মদীনার লোক শোকাভিভূত হয়ে পড়লো। রাসূলের পুণ্যাত্মা সাহাবীগণ ও শোকাকুল হয়ে পড়লেন। এর আগেই এঁরা নবী শোকে বিচলিত ছিলেন— তদুপরি এ নতুন শোক তাঁদের অধিকতর ম্রিয়মান করে তুললো। নবী নন্দিনীর সদাচার, স্বেচ্ছা দারিদ্র ও অভাব, পবিত্রতা এবং মহত্বের স্মৃতি ও ত্যাগ জাগ্রত হচ্ছিল। মদীনায় এমন কোনো লোক ছিলো না যে, তাঁর বিচ্ছেদে যিনি মনে আঘাত পাননি।

হযরত হাসান হোসাইনের চেহারা শোকে মলিন হয়ে গিয়েছিলো। তাঁদের মনে কখনো মাতামহ হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্মৃতি—কখনো বা স্নেহময়ী মাতার স্মৃতি জাগরিত হচ্ছিল। ..... পিতা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, কিন্তু তাতেও তাঁরা শান্ত হতে পারছিলেন না।

হযরত ফাতেমা যোহরার ইহলোক ত্যাগের সংবাদ দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং বিশ্বের নারী সমাজ তাঁর অন্তর্ধানের সংবাদ শুনে

খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন তৎকালীন নারী সমাজের গৌরব। ..... (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- **পর্দা ও ইসলাম**
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- **স্বামী স্ত্রীর অধিকার**
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- **মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয়**
  –অধ্যাপক গোলাম আযম
- **নারীর নিকট ইসলামের দাবী**
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- **মহিলা সাহাবী**
  –তালিবুল হাশেমী
- **সংগ্রামী নারী**
  –মুহাম্মদ নূরুয্যামান
- **মহিলা ফিকহ ১ম ও ২য় খণ্ড**
  –আল্লামা আতাইয়া খামীস
- **ইসলাম ও নারী**
  –মুহাম্মাদ কুতুব
- **ইসলামী সমাজে নারী**
  –সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী
- **আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা**
  –আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ
- **আল কুরআনে নারী ১ম ও ২য় খণ্ড**
  –অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন
- **একাধিক বিবাহ**
  –সাইয়েদ হামেদ আলী
- **নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকার**
  –শামসুন্নাহার নিজামী
- **নারী মুক্তি আন্দোলন**
  –শামসুন্নাহার নিজামী
- **পর্দা একটি বাস্তব প্রয়োজন**
  –শামসুন্নাহার নিজামী